শিক্ষা ও বিজ্ঞান

0 6 AUG 1989

মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী চক্রান্তের গোড়ার কথা

আহমেদ সেলিম রেজা

এডাম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৮৩৫-৪০) পাঠ করলে দেখা যাবে এ দেশের বৃটিশ রাজত্ব কায়েমের পর ইংরেজরা মুসলিম শাসনামলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযানের জন্য কাহাতক পরিশ্রম করেছে। তারা প্রথমে ফারসী ও আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালু করে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় একলক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) ধ্বংস করে দেয়। যাতে রাজ্যহারা মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পঙ্গু ও সর্বশান্ত করে দেয়া যায়। তাই ইংরেজরা প্রথম নীতি হিসাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে করে মুসলমানরা বৃটিশ বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়ঃ "এ দেশ আমাদের অধিকারে আসার আগে তারা (মুসলমান) শুধু যে রাজনৈতিক নিয়ন্তা ছিল তাই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও ছিল তারা প্রধান শক্তি।" মুসলমানদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব খর্ব এবং নির্মূল করার উদ্দেশ্যে হান্টার সাহেব লিখেনঃ "ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি এবং যেই মাত্র এই নতুন ব্যবস্থায় যথেষ্ট নতুন লোক শিক্ষিত হয়েছে তখনই আমরা পুরনো মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আর তাতে মুসলমান যুবকদের সামনে কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

উল্লেখ্য, এহেন ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণের, ফলে ঐ সময় শিক্ষক, কর্মচারীসহ মোট ৬ থেকে ৭ লাখ লোক বেকার হয়ে যায়। তাছাড়া 'আয়েমা লাখেরাজ ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন ১৮১৮' বলে ১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছরে মুসলমানদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা)-এর সকল সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতে করে মুসলমানদের শিক্ষার দ্বার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। মোটকথা তদানীন্তন বৃটিশ আমলে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য বৃটিশ এবং হিন্দুরা একযোগে মুসলিম আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার এমন শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে যার অভিশাপ থেকে আজও বাংলাদেশের মুসলমানগণ মুক্তি পায়নি। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ যা শিখার জন্য উদগ্রীব তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। আর যা তাদের ঘৃণার উদ্রেক করে তা বহুল পরিমাণে শিক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এটাই ছিল মেকলে প্রবর্তিত আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ঘটনা। এই শিক্ষাই আজও বহাল তবিয়তে আমাদের স্বাধীন দেশের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয়, খোদ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে ষোলআনা। আজ মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের নামে সেখানে চলছে ইংরেজী কায়দায় ইসলামী শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ফিরিঙ্গি সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের প্রতিযোগিতা। ইংরেজী শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে মুসলমানদের ঈমান ও আকিদা পরিপন্থী বিষয় ও বক্তব্য (সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত) আজ নতুন করে আবার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি। আর তা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের কাছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সে সময়ে গৌড়, পাণ্ডুয়া, মহিসান, বাঘা, সাতগাঁও, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সোনারগাঁয়ে যেসব মাদ্রাসা ছিল সেগুলোর ভগ্নাবশেষ আজও বৃটিশ শাসকদের মুসলিম শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বর্বরতার স্বাক্ষর বহন করছে। স্যার টমাস রো'র গ্রন্থে মুসলিম আমলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) সমূহের গৌরব এবং বৃটিশ কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের চিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ম্যাকস মূলারের রিপোর্টেও উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ সময় সমস্ত ... প্রতিষ্ঠান ...

নিরীহের জন্য ... ছিল প্রতি ৪০০ জন ছাত্রের জন্য একটি মাদ্রাসা।

রাজ্যহারা মুসলমানদের পদানত ও দুর্বল করার জন্য ইংরেজদের দু'টি পলিসির মধ্যে একটি ছিল— শিক্ষা ও চাকরি হতে মুসলমানদের বিতাড়ন। দ্বিতীয়টি ছিল— আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানদের পঙ্গু ও সর্বশান্ত করে দেয়া। অবশ্য এ দু'টি কাজ তারা অত্যন্ত যত্নের সাথেই সমাধা করেছিল। এ প্রসঙ্গে ইউলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেছেনঃ "বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষায় মুসলমানদের হৃদয়ের ৩টি প্রগাঢ় অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে— ১· পার্সী ও আরবী ভাষার পরিবর্তে তদানীন্তন দেশের আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ও এ কাজে হিন্দু শিক্ষা নিয়োগ। ২· মুসলমানদের জীবনের মর্যাদা ও স্বীয় ধর্মের চর্চা ও অনুশীলন সমৃদ্ধ ভাষা ও বিষয়বস্তু বঞ্চিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন। ৩· মুসলমান যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষাকরণ।

বৃটিশ ভারতের এই শিক্ষা ব্যবস্থাই মুসমানদের জাতীয় সত্তা ও স্বীকৃতির কবর রচনার প্রয়াশ পেয়েছিল। কিন্তু আঞ্জুমান আন্দোলন (১৮৬০-১৯১০)-এর ফলে বাংলাদেশব্যাপী আবার মাদ্রাসা শিক্ষার পত্তন ও পুনর্জাগরণ শুরু হয়। বলা বাহুল্য, সেটা ছিল সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের পরবর্তী পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া। দৃশ্যতঃ ঐ সময়ের বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১· ইংরেজী-মাধ্যম বিশিষ্ট দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২· অমুসলিম ও দরিদ্র ভারতবাসীদিগকে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে খৃশ্চিয়ান মিশনারী স্কুল।

৩· ইংরেজদের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মুক্ত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উল্লেখ্য, ইংরেজী-মাধ্যম বিশিষ্ট দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু শিক্ষকগণকে শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত করা হয়। তারা এসব প্রতিষ্ঠানে যুগপৎ বৃটিশ এবং হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিবেদিত ছিলেন। বাইবেল ও রামায়ন-মহাভারতের বিষয়বস্তুর আলোকে এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত ও নিয়ন্ত্রণ হতো। আর এই জন্যই মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী প্রণীত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের সন্তানদের পাঠায়নি। বরং দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে আঞ্জুমান আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানগণ নিজদিগকে পুনরায় সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর এটা ছিল মুসলমানদের জীবনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, এক তাৎপর্যময় ঘটনা।

এই সময়ে নতুনভাবে গঠিত মুসলমানেরা আবার উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে, এখানে আর অসি নয় এবার মসির সংগ্রাম শুরু করতে হবে। তারই বিকল্প হিসাবে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো একাধিক মক্তব ও মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনগণের দান-খয়রাত ও সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে। ধর্মীয় ভাষা আরবী ও ফার্সীর মাধ্যমে পাক কুরআন, হাদীস শরীফ ...

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। মূলতঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমলে প্রবর্তিত 'দরসে নেজামীর' অনুসরণেই এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে থাকে। হজরত মাওলানা কাসেম নানতুবী (রহঃ)-এর 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' হচ্ছে ঐ সময়ের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের মাদ্রাসাগুলো সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে রাজনীতিশূন্য ইসলামের অপূর্ণ আদর্শবাদের শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এ জাতীয় মাদ্রাসাগুলোকে পরবর্তীতে কওমী বা খারেজী মাদ্রাসা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে ইংরেজ শাসকরা তাদের স্ট্রাটেজী কিছুটা রদবদল করল। তারা মনে করতে লাগল মুসলমানদের মধ্যে এখন আর ভয় করার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই, তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং বৃটিশ রাজত্ব মুসলমানদের নিকট বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য মুসলমানদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই তারা ইংরেজী শিক্ষাকে মুসলমানদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করে, তোলার জন্য বিভিন্নপন্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করল। তারা স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে 'নৈতিক শিক্ষা' বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করল।

১৮৮২ সালে Indina Education Commission-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে তদানীন্ত বাংলাদেশ সরকার এই অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচারের কথিত উদ্দেশ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এই সময়েই ইংরেজ সরকার 'ইংরেজী' শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার অর্ন্তভুক্তির প্রয়াশ পায়। এই সময় তারা উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, মুসলমানদের ঐসব মক্তব মাদ্রাসাগুলো ক্রমাগত বৃটিশ শাসনের প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি করে চলছে এবং মুসমানদেরকে বিদ্রোহী করে তুলতে সাহায্য করছে। কৌশলী ইংরেজগণ দ্রুত ঘটনার মোড় পরিবর্তনে প্রয়াসী হল। তারা আবার চাতুরীর আশ্রয় নিল এবং মুসলমানদেরকে বশংবদ জাতীতে পরিণত করার প্রয়াশ পেল। যেমন— প্রথমতঃ উইলিয়াম হান্টারের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার ধীরে ধীরে তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলোতে আরবী এবং ফার্সী শিক্ষার সুযোগ করে দিল এবং এই দু'টি বিষয় পড়ানোর জন্য 'মৌলবী' শিক্ষকতার পদও সৃষ্টি করা হল। পক্ষান্তরে ১৭৯১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী হতে ১· হাদিস ২· তাফসীর ৩· উসুল আল ফিকহ বিষয়গুলো ঐচ্ছিক বিষয়ে রূপান্তর করা হয়েছিল। নিম্নোক্তরূপে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিন্যস্ত করা হলঃ

১· প্রকৃত দর্শন ২· ধর্মশাস্ত্র ৩· আইন (মুসলিম আইনসহ) ৪· জ্যোতিশাস্ত্র ৫· জ্যামিতি ৬· পাটিগণিত ৭· তর্কশাস্ত্র ৮· কাব্যালঙ্কার ও ৯· ব্যাকরণ। উল্লেখ্য, বর্তমানেও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এই পাঠ্যক্রম সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

চোখ পড়ে এবং তারা মাদ্রাসাগুলোতে সরকারী অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বেশীর ভাগ মাদ্রাসাই সরকারের এই উদ্যোগকে সুনজরে দেখেনি এবং সরকারের দেয়া সাহায্যকে 'হারাম' জ্ঞান করে বর্জন করে। আবার কিছু কিছু মাদ্রাসা 'উদারতা' দেখিয়ে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে। ফলে বাধ্য হয়ে এসব মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে তৎকালীন সরকারের নীতি অনুসারে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করতে হল। পক্ষতঃ এসব মাদ্রাসা পরবর্তীতে নিউস্কীম মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃত হল এবং এই পর্যায়ে ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ওল্ড স্কীম (old Scheme) মাদ্রাসা সিবে পরিগণিত হল। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় সরকারী সাহায্য নিতে অস্বীকৃতির কারণে আঞ্জুমান আন্দোলনে ফলে প্রতিষ্ঠিত বা তার আগে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো 'কওমী' বা 'খারেজী' মাদ্রাসা হিসাবে চিহ্নিত হল।

উল্লেখ্য, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে সরকারী উদ্যোগে যে তিনটি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল তা ছিল উপরোক্ত 'নিউস্কীম' মাদ্রাসা (অধুনা বিলুপ্ত)। সেগুলো হল বর্তমানের ঢাকার কবি নজরুল ইসলাম কলেজ, রাজশাহী ইসলামিয়া গভঃ এবং চট্টগ্রামের সরকারী মোহসীন কলেজ।

মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই ত্রিমুখী সংকট থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হলেন তৎকালীন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশের নওয়াব আবদুল লতিফ। তবে তাঁরা চাইছিলেন প্রথমতঃ বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে। তাই তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। যাতে ইতিমধ্যে অর্জিত বর্ণহিন্দুদের ভাষা সভ্যতা বৃটিশের অধীনে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তির মনোপলি অচীরে খর্ব করা যায়। ফলে তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষাকোর্সে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ১· আরবী ২· ইংরেজী ৩· এংলো পার্সিয়ান তিনটি ডিপার্টমেন্ট চালু করা হয়। কিন্তু এতে করে মুসলমানদের শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ এক· এই মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। দুই· শিক্ষামান ও বৈষয়িক মর্যাদার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তুলনায় মাদ্রাসার ছাত্ররা ছিল উপেক্ষিত।

এই অবস্থা থেকে আজও মাদ্রাসার ছাত্ররা বেরিয়ে আসতে পারেনি। এমনিভাবে ধীরে ধীরে মুসলমান ছাত্রদের মনে গড়ে উঠেছে হীনমন্যতাবোধ।

ফলতঃ কলকাতা মাদ্রাসা কেন্দ্রিক মুসলমানদের ভবিষ্যত অবস্থা দাঁড়াল নিম্নরূপঃ Under the circumstances the Madrasah graduates were reduced to the necessity of either becoming riligious howevers, living mainly on the cherity of others or becoming Imanes and muaffins atached to some mosques on starvation ways.

Report of the Calcutta ...versity ...